বাংলা মা

প্রবীর আচার্য

দিনটা ছিল ৮ই শ্রাবণ ১৮১২ সাল। আমরা কোশীয় পত্রিকার (লিট্‌ল ম্যাগাজিন) এক দঙ্গল সাহিত্যিক কাটোয়া থেকে ছোটোলাইনে চেপে লাভপুরে গিয়ে নামলা। দেকি স্টেশনে বসে এক বুড়ি হাপুস নয়নে কাঁদছে। মাথায় তার শনের নুড়ি চুল একগাদা সিঁদুরে লাল। জিজ্ঞেস করলাম, বুড়িমা কাঁদছো কেন?' সেকথার উত্তর না দিয়ে বুড়ি আমাদের জিজ্ঞেসা করল, 'তোরা কোথা যাবি?'

বললাম, 'আমরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছি।' শুনে বুড়ি ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। বহুকষ্টে তাকে চুপ করিয়ে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করতেই এবার সে চেঁচিয়ে গলা পাড়তে লাগল, 'নামুনে বাঁশচাপারা, মর তোরা!' আমি বললাম, 'তা না হয় আমরা মরলাম, কিন্তু তোমার কান্নার কারণটা কী?' বুড়ি বলে উঠল, 'কাঁদবো না আমি? ছেরটাকাল নোকে নাভপুর এয়েচে আমাকে পেন্নাম করতে। আমি হলাম গিয়ে মা ফুল্লরা। আর আক্ কিনা নোকে আমাকে ছেড়ে দেক্‌তে আসছে ওই তারা বুঁড়ুজ্জে না কে একটা ছোকরাকে। তাহলি আমার হিংসে হবে না?'

বললাম, 'তা তুমি রাগ করছো কেন মা? তারা বাঁড়ুজ্জে তো তোমারই ছেলে।' এবার কী ভেবে ফিক্ করে হেসে ফেলল বুড়ি, 'অ! তাই নাকি? গন্ডা গন্ডা কত অপোগন্ড বিইয়েচি, অত কি আর মনে আচে? তার মধ্যি কোনটা মানুষ হল আর কোনটা হল না, তা কি ছাই বুঝতে পারি? বেঁচে থাকুক তারা বাঁড়ুজ্জে, তার শত বচ্ছর পেরমায়ু হোক।'

'আর মা! তুমি কোনো খবরই রাখো না দেখছি। তিনি তো কবেই মারা গেছেন। শতবর্ষ পরমায়ু হলেও এতদিন বাঁচতেন না। এই ১৮১২ বঙ্গাব্দটা তাঁর একশ সাততম জন্মবর্ষ।' বলতেই বুড়ি আবার সুর করে কাঁদতে লাগল, 'হাঁয়! হাঁয়! আমি হলাদ গিয়ে বাংলার মা, মুখ্যু সুখ্যু মানুষ গন্ডা গন্ডা ছেলে খালি বিইয়েই যাই। তাদের মানুষ করা তো দূরের কথা, চিনতেও পারি না। মুখ্যুর অশেষ দোশ গো।'

'মা গো, কপাল না চাপড়িয়ে লেখাপড়াটা শেখো। তবে তো ছেলে মানুষ করতে পারবে।' বলে আমরা হাঁটা দিলাম তারাশঙ্কর ভবনের উদ্দেশে।

সৃষ্টিসন্ধান